ভরার মেয়ে

স্বরাজ সেনগুপ্ত

ভরার মেয়ের নাও যখন মোহনপুরের বউডুবির ঘটে এসে শিমূল গাছটার মোটা শেকড়ে দড়ি বাঁধল তখন শীতের সন্ধ্যা। কালোজিরা নদীর জল শুকিয়ে প্রায় পাঁচ হাত নীচে নেমে গেছে। ঘাটে -পাতা খেজুর গাছটা পলি মাটিতে ঢাকা পড়ে পিছল। ডান হাতে হুঁকো বাঁ হাতে চাদরের আড়ালে তাওয়াবা তুষের আগুন - মাধব গোঁসাই নাও থেকে খেজুর গাছটায় পা রাখতেই বেসামাল হয়ে পা পিছলে পড়ল কাদায়। হুঁকো-কলকে ছিটকে গিয়ে পড়ল নদীতে। কলকেটা ডুবে গেল, হুঁকোটা ভেসে গেল স্রোতের টানে। তুষের আগুন ছড়িয়ে পড়ল, ধুতিতে গায়ে ছ্যাঁকা লাগল। এখানে সেখানে। উঃ আঃ মরচিরে মরচি— কাঁকিয়ে উঠল মাধব গোঁসাই। কাদা মাখামাখি হয়ে কোনও মতে সামলে সুমলে দাঁড়াতেই আবার চিৎপাত হয়ে পড়ল খেজুর গাছটার ওপরে। কোমরে চোট পেয়ে এবার প্রায় কেঁদেই ফেলল। ছাইয়ের ভেতরে যে তিনটি কুলীন মেয়ে মা-বাপের ওপর ক্ষোভে, ভাই-বোন ঘরবাড়ি ছেড়ে আসার দুঃখে চোখের জল মুছে মুছে আঁচল ভিজিয়েছে, তারাও খিলখিল করে হেসে উঠল। মাধব গোঁসাই খেপে উঠল— হতচ্চারি মাইয়া গুলাইন, কিলকিলালাইতেচিস কোন আক্কেলে, তোগে পার করাইতে আইয়াই তো মোর আইজ এই দুব্বোগ—উঃ মাজা বুঝি গ্যাচে—উঃ। বাল দাম না পাইলে ট্যার পাবি মজা, মা বাপের কাচে আর ফেরত দিমু না, হ্যারা তোগে আর গরে ডুকাইবেও না। ট্যাহা খাইচে না! মাজ গঙ্গে ঠেইল্যা ফেলাইয়া নাও লইয়া চইলা যামু। অহন কিলকিনীনি বাইরাইয়া যাবে।

হটাৎ কী খেয়াল হল সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হইয়ের ভেতরে মুখ বাড়িয়ে বলল— ও কুসুম, তোরে কিন্তু গাইল দি নাই, তুই মোর লক্‌খি মাইয়া! ওই কেলটে দুইডাকে গাইল দিচ্ছি, আগো য্যামন ছিল, ত্যামন ব্যাভার। কোনও কুলীন পুরুষ অগো গরে নেবে না, বায়াতুইরা বুরাও মুক গুরাইয়া থাইকবে। বিড় বিড় করে বলল, তরে মুই যুগ্গি পাত্তরের আতেই দিমু, লকখি পামু। অবিরাম ঘোষাল তরে দ্যাকলে আর কতাড়ি কইবে না, চা চামু হেইয়াই দেবে। কুসুম, তুই ছইয়ের ভেতরে চুপ কইরা বইয়া থাক্, হুট কইরা গলুইতে বাইরাবি না। মাঝিকে বলল—ফটকে, তুই আগো দেহিস, মুই এ যামু আর আমু।

কাদায় মাখামাখি ধুতি চাদর পরেই মাধব গোঁসাই শরীরে অন্ধকার দ্রুতপায়ে কোন দিকে যে অদৃশ্য হয়ে গেল, বোঝা গেল না। ছইয়ের ভেতরে তিন কিশোরীর ফিসফাস কথা, কলা একটু উঁচু হলেই ফটিকমাঝি ধমকাচ্ছে, লম্বা লগি একটা হাতে নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে— ধারালো চোখে এদিক ওদিক দেখছে। নৌকো করে এ-গাঁয়ে সে-গায়ে কুলীন মেয়ে বেচাকেনার খবর জেলা-শহরের ম্যাজিস্ট্রেটের কানেও গেছে। ভরার মেয়ে বেচাকেনার প্রতিবাদে বরিশাল শহরে সভামিতি, লেখালেখিও হচ্ছে। যখন তখন পুলিশের লঞ্চ অথবা বোট নদীনালায় ঘোরাফেলা করে। দিনকালও খারাপ। ডাকাতরা এসে ছোঁ মেরে তিনজনকেই তুলে নিয়ে যেতে পারে, অন্য কোনও দূর গাঁয়ে নিয়ে সস্তায় বেচে দেবে, এদেশে কুলীন মেয়েদের কিনে নিতে পারে এমন কুলীন বামুন, বদ্যি, কায়েতের অভাব নেই। তবে এ অঞ্চলে মাধব গোঁসাই -এর মতো বিশ্বস্ত আর কেই নেই— কুলীনের ঘরে সে কুলীন মেয়েদেরই দিয়ে আসছে বহু বছর ধরে। না , ভেজাল দিযে সে, কুলীন ঘরের কৌলীন্যে কালি লেপেনি।

ছইয়ের ভেতর বাতাসি আর বিলাসি কুসুমকে জ্বালিয়ে মারছে। লম্বা বেণী ধরে টানছে। থুতনি ধরে টিপে দিচ্ছে। ফরসা গালে চিমটি কাটছে, আবার বুকে হাত রেখে বলছে—আহা য্যান দুইটা কাচা ডউয়া। আর মোরা তো তোর বয়সেই কত আগে জইরা গেছি, কানা কালা খোড়া চারা মোগো কপালে কেউ নাই। মোগে ঘরের বন্ন তর নাহান না। হ, মোরা কেলটে, কিন্তু মোগো আর কীসের কমতি ছিল। কাইরাকুইরা সব নিয়া কারা মোগো ছিবড়া বানাইয়াছে, পোরা কপাল, হেয়া কারো মোরা কমু! বলতে বলতে বাতাসি সত্যি কপাল চাপড়াতে লাগল। বিলাসি বলল—কে যে এমন একহান নাম মোর দিছিল! বাপমায় অ নামে মোরে কহনো ডাকে নাই, হেরা মোরে ডাইকত মরনি। বড় পুহইরে চুবাইয়া মাইরতেও চাইছিল একদিন। হঠাৎ আরাদন দাদু আইয়া পইরা মোরে বাচাইল। বাচাইল, না বাচাইলেই ভাল আছিল— বুড়াডাও যে এক্‌ডা জইন্তু ক্যামনে বুঝমু। এহন আবার কোন বুড়া খডাসের আতে পরমু কেডা জানে!

আবার ফটিকমাঝির ধমক। সবাই চুপ, কুসুম কোনও কথা বলছিল না। হাঁটুতে মুখ গুঁজে দাশুর কথা ভাবছিল। দাশুদা, তুমি এট্টা ভিতুর ডিম! নগেন পন্ডিতের ছেলে দুশু— দাশরথি ঘোষ। ওরা একসাথে নগেন পণ্ডিতের পাঠশালায় পড়ত। বাবা বুড়ো হয়েছেন, এখন দাশুই পাঠশালার পণ্ডিত— একটা দুটো পাশও করেছে, বিত্তি পেয়েছে। সেও তো বানান লিখতে শিখেছিল, শতকিয়া বলতে পারত, দশঘর পর্যন্ত নামতাও।

কত আর বয়স হবে দাশুর— তার চেয়ে তিন-চার বছরের বড়। কী গম্ভীর মুখ করে সাদা চাদর গায়ে জড়িয়ে পাঠশালায় উঁচু বেদিটার ওপরে গিয়ে বসে। কুসুম কতদিন দূর থেকে হেসে জিভ ভেংচে পালিয়েছে। দেখতে পেলে দাশু চোখ বড় বড় করে শাসাত। হাসতে হাসতেই আবার পুকুরঘাটে গিয়ে কেমন বিষণ্ন হয়ে বসে পড়ত, মনে মনে বলত—বিত্তিই পাও, আর পণ্ডিতই হও, তুমি কুলীনবামুন না, মোরে জোর কইরা নিবা, সে সায়সও তুমার নাই। জলে নিজের ছায়া দেখে ভাবত—আমি তো এট্টা ছায়াই, আমার মনও নেই, শরীরও নেই, ছায়ায় কোন দাগও নেই। মাধব

গোঁসাই ব্যাবার কাচে রাইতদিন যেভাবে ঘুরাফিরা করচে। আমি শিগগিরই ভরার মইয়া অইয়া কোন দূরে দ্যাশে জলের তলায় এই ছায়াডার নাহান ডুইবা ভাইসা যামু।

দাশু ওকে খাড়া আখারা তালপাতাগুলো সব দিয়ে দিয়েছিল। সে কতদিন পাততাড়ি দিয়ে জড়িয়ে যত্ন করে রেখেছিল। হঠাৎ একদিন দেখল, সেগুলো নেই। পিসি বলল ওগুলো দিয়ে সে ধান সেদ্ধর উনুন জ্বালিয়েছে। খুব কেঁদেছিল সেদিন। মাও পিসিকে বলেছিল—আর তালপাতাগুলাইন পোড়াইলেন ক্যান, ওগুলাইন বিদ্দা, বিদ্দা আগুনে পোড়ায়? বাবা মা-মেয়েকে এক গর্জনে থামিয়ে দিয়েছিল।

দুই

মাধব গোঁসাই এবং সেই সঙ্গে আর দু'তিনটে অচেনা গলার কথাবার্তা শুনে তিনজনেই ভয়ে আতঙ্কে কাছাকাছি এসে ঘন হয়ে বসল। বাতাসি বিলাসি কুসুমকে একটু - আধটু হিংসা করলেও ভালওবাসে। ওদের জীবনে কত যে দুঃখ যন্ত্রণা আছে সে ওরা জানে—সে তো ভাঙা ছেঁড়াফাঁকা জীবন, তার পরে ভেসে যাওয়া। কিন্তু তাদের মোহনপুর গাঁয়ের সুন্দর মেয়ে কুসুম অন্য সব ভরার মেয়ের মতো ভেসে যাবে! না, তা ওরা চায় না। সেই কোন শিশু বয়সে কথা বলতেও যখন ভাল করে শেখেনি, তখন থেকে শুনে আসছে, দিদিমা-ঠাকমাদের কাছে ভরার মেয়ের জীবনের ভয়-পাওয়া গল্প। গাঁয়েঘরে তো বিধমা দিদিমা, ঠাকমার সংখ্যা কমতি ছিল না। তাদের মধ্যেও তো দু'চারজন ভরার মেয়ে ছিল। ভেসে ভেসে এসে তারাও তো সমাজ সংসারের আবর্জনা হয়ে আবর্জনাতেই তলিয়ে গেছে। সবাই তো আর বাতাসির, বিলাসির মতো কেলটে কুচ্ছিতও ছিল না। মুখুজ্জে বাড়ির সুন্দরদি সুন্দরীই ছিলেন। যেমন গায়ের সোনা রং, তেমনি নাকি নাক মুখ চোখ যেমন কুমোরের গড়া পিত্তিমে। হরি মুখুজ্জের চার নম্বর গিন্নি হয়ে কী পেলেন তিনি! কৌলীন্য বাঁচাতে তার বাবঠাকুরদা ওই গেঁজেল লম্পটটার হাতেই তাঁকে উচ্ছুগ্গো করে দিলেন। মনে পড়ছে সুন্দরদি তাদের শুনিয়ে গুনগুন করে গাইতেন— গাইতেন না কাঁদতেন?

হায়রে, হায় হায়
ভরা মাইয়া ভাইসা যায়
কুল রাইখতে কোন অকূলে,
মধ্যি গাঙ্গে নাও উঠছে দুলে দুলে
ভরার মাইয়া কাইন্দ্চে বেরথা ফুলে ফুলে
হায়রে হায়, হায়
ভরার মাইয়া ভাইসা যায়...

মাধব গোঁসাই ডাকল— 'বাতাসি, বিলাসি তোরা দুইজনে বাইরাইয়া আয়। ফটিক লগিডা তুই এ মাথায় ধর, এই মাতা আমি দরছি, লগিডা দইরা খেজুর গাছডাঙায় পাও টিইপা টিইপা আয়। চাপা গলায় বলল— দেহিস জলকাতায় পইরা পেত্নি অইয়া নামিস না। বাতাসি, বিলাসি হগিটা ধরে পা টিপে টিপে ধীরে ধীরে নেমে এসে পারে উঠে শিমূল গাছটার তলায় মাথা নিচু করে দাঁড়াল। মাধব গোঁসাই বলল— এই যে দ্যাহেন কত্তারা, সুলক্ষণা দুই কুলীন কইন্যা, কাজে কম্মে চতুর। মুখে চোপাটি নাইত রান্দনবাড়ন, যত্নআত্তি, আপনাগো দাসী অইয়া থাইকব— চক্কোত্তিমাশাই, এই আর নাম বাতাসি, অ্যাক্কেবারে আপনের লেইগাই বগমান আরে পাডাইছে। এই বাতাসি, মশায়ের পায়ে স্যাবা দে, স্যাবা দে। নিরুপায় বাতাসি এগিয়ে এসে রামধন চক্রবর্তীর পায়ের কাছে নিচু হতেই দেখে পায়ের পাতা থেকে খাট ধুতির ঝুল পর্যন্ত লালচে ঘা। বাতাসি ঘেন্নায় মুখ ফিলিয়ে নিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে নদীর জলের দিকে চেয়ে রইল।

আর দেরি কইরতে আছেন ক্যান? অরে লইয়া মা কালির থানে যান, পুরইতঠাউর বইয়া আছেন— তেনারে আমি আইয়াই খবর দিয়া দিছি। আর রায়মশায়, এই কইন্যা আপনের। বাল মাইয়া, শান্ত, গুরুজনদের মান্যি করে। ওর বাপ কইয়া গেছে, ছিরিযুকত্ কালাচাঁদ রায় রাজি অইলে চেনাক আতেই দিও। উদার পেরানের মানুষ—চাইর-পাচডি কুলীন কইন্যারে এই বয়সেই তেরান করেছেন। যান যান, আর দেরি কইরবেন না, রাত্তির অইতেছে। পুরইতঠাউর এইবার রাইগ্যা যাইবেন, দক্কিনার অঙ্কও বাইরা যাইব। রামধন চক্রবর্তী বললেন—কালাচাঁদ, গোঁসাই ঠিক কথাই কইছেন, আর দেরি কইরা কাম কী? চলো আমরা আইগাই—বলে গোঁসাই এর কাছে এসে ধুতির খুঁটে বাঁধা একাট কাপড়ের ছোট্ট থলে বার করে তাঁর হাতে দিলেন। তারপর একটু দেরি না করে বাতাসির হাত ধরে টেনে কালির থানের দিকে হাঁটলেন।

কালাচাঁত রায় মাধবের কাছে এসে ফিস ফিস করে বলচে—দর এট্টু নামাও গোঁসাই—এই টাহা-দুই, কইন্যার বন্নতো গাবের কসের নাহান।

—না না, রায়মশাই, তা অয় না, এক্কেবারে মইরা যামু, আচ্ছা আপনের মান রাইখতেই, —অ্যাক টাহা কম দ্যান।

কালাচাঁদ রায় আর দরাদরি করলেন না বিলাসির দিকে গেিয়ে আসতে আসতেই ট্যাকা থেকে রুপোর টাকাগুলো বার করছিলেন—তিন চারটে মাটিতে পড়ে বিলাসির পারে কাছে গড়িয়ে আসতেই ওগুলো হাতে তুলে নিয়ে ওর কী যে হল—হি হি করে হেসে উঠল, মোহনপুর গ্রামের রাত্রির অন্ধকার যে হাসিতে কাঁপতে থাকল। মাধব গোঁসাই,

কালাচাঁদ রায়, ফটিকমাঝিও কেমন ভয় পেয়ে বোবা হয়ে গেল। ফটিকমাঝি লগি হাতে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। পর মুহূর্তেই বিলাসি নিজেই কালাচাঁদ রায়ের একটা হাত ধরে বলে ফেলল—চলেন, আর দেরি ক্যান, চলেন! রাত্তির ফুরাইয়া গেলে আপনের নাতবউ - নাতনিরা আর বাসর জাগবে কহন। চলেন। আবার সেই অন্ধকার কাঁপানো হাসি। বিলাসির হাসিটা যে বুকের মধ্যে কান্না হয়ে পাথরের মতো ভারি হয়ে উঠছে তা বোধহয় সে নিজেও জানল না।

জোয়ার জলে নৌকাটা দুলছে। দুলুনিতে কুসুম বসে বসেই হাঁটুতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। মাধব গোঁসাই ডাকল—কুসুম, মা লকখি, ওই বাইরে আইয়া চাইয়া দ্যাখ, ঘোষালমশাই তরে বরণ কইরা ঘরে হইয়া যাইবেন। ও মা, ওঠ। নরম শরীর, নরম মন, ঘুমাইয়া পড়নের আর দোষ কী! আর একবার গোঁসাইয়ের ডাক শুনেই কুসুম চোখ মুছতে মুছতে ছইয়ের বাইরে এসে দাঁড়াল। জোয়ারের নদী তখন পার ছুঁয়ে ভরে উঠেছে—নৌকা থেকে শিমুলের মোটা শেকড়টায় পা রাখা যায়। মাধব গোঁসাই হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ধর মা ধর। কুসুম গোঁসাইয়ের হাত ধরে শেকড়টা পা রেখে পারে উঠে এল। উঠে এসেই শিমুলের মোটা ডালটায় মাথা রেখে আবার চোখ বুঝল। মাধব গোঁসাই হেই হেই করে বলে উঠল কাঁড়া, কাঁড়া আছে, গালে লাইগবেরে। সত্যিই দু'চারটে ভোতা কাঁটার খোঁচ খেয়ে কুসুম চোখ খুলে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

তিন

কুসুম অভিরাম ঘোষালকে দেখছে না, মাধব গোঁসাই, ফটিককেও না, সে দেখছে অভিরামের পাশে তেলতেলে হাঠি হাতে দাঁড়ানো এক যুবককে—মাথায় ঝাঁকড়া চুল, চওড়া বুক, দু'হাতের পেশি মোটা কাপড়ের শার্টের হাতায় আড়ালে লাফালাফি করছে, কাকের দুই ডানার মতো ভুরুর নীচে দুটি সরল স্বচ্ছ চোখ। কুসুম তো শুধু তাকেই দেখছে, একবার চোখাচোখি হতেই তার চোখের চাইনি মাটির দিকে স্থির। হাঠিটা বাঁ হাত থেকে ডান হাতে নিয়ে মাটিতে ঠুকে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মাধব গোঁসাই কুসুমের একটা হাত ধরে টেনে এনে অভিরাম ঘোষালের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। কুসুম আরও একবার পিছন ফিরে লেঠেল লোকটাকে দেখল। বুকের ভেতর একটু শকুনের নখের আঁচড়, ফোটা ফোটা রক্ত। একবার দাশুর মুখটা মনে পড়ল, অন্ধকারে মুখটা হারিয়ে গেল। 'বিতু" শব্দটা উচ্চারণ করল বেশ জোরেই। মাধব গোঁসাই প্রশ্ন করল—কী কস? কুসুম চুপ।

অভিরাম ঘোষালের জিভটা পানের রস আর লালার আঠায় মুখের মধ্যে অনড়, মুখ দিয়ে একটা কথা বেরুতে পারছে না। বাহাত্তুরে শরীরের একটা কুৎসিত কাঁপন—কাঁপা হাতেই ট্যাকা গোঁজা থলেটা মাধব গোঁসাইর হাতে তুলে দিল। দরাদরি করার কথা মনেই পড়ল না।

কুসুমকে বলল—চল। মাধব গোঁসাইও বলল—হ মা লকখি যা —তোর অদেষ্ট বালো, তাই অ্যামন মশাইরে পাইলি। যা, যা আর দেরি করিস না। বলে দ্রুত পায়ে ঘাটের দিকে চলল। অভিরাম ঘোষাল কুসুমের পিঠে কাঁপা কাঁপা হাত রেখে ঠেলা দিয়ে বলল— চল। লেঠেলটাকে বলল—ও অভয়চরণ, তুই পিচে পিচে আয়। চাইরদিক নজর রাইখা আয়। বলতে বলতে নিজেই বাঁদিকে হোগলা আর তারা গাছের জঙ্গলের দিকে তাকিয়েই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভয়ার্ত ফিসফিসে গলায় বলল—অভয়চরণ, দ্যাক দুইডা চক্ষু, নীল নীল—বাগ্। এবার তার শরীর জুড়ে অন্য কাঁপন—মুহূর্তেই পরনের কাপড় ভিজে গেল। একটা বমি-আসা দুর্গন্ধি। লেঠেল অভয়চরণও গায়ের শার্টটা তুলে নাখ মুখ চেপে ধরল। কুসুম স্থির। শুধু দাঁতে দাঁত চেপে চাপা গলায় বলল—আমি মরমু না, কিছুতেই মরমু না। আমি বাচমু, আমি বাচমু। বলে অভয়চরণ তাকে ধরতে পারার আগেই আচমকা জঙ্গলের দিকে ছুটল। মাটিতে বসে পড়া অভিরাম চেঁচিয়ে উঠল—অভয়চরণ ধর, ধর। গোঁসাই মোর কাইচ থেইকা পচিশডা রুপার টাহা লইয়া গেচেরে...হায়, মোর হগলই গেল...ধর ধর, ...অরে ধর।

অভয়চরণও নীল নীল চোখ দুটো দেখেছিল। কিন্তু ওর শরীরে তো ভয়ডর নেই। তেলতেলে লাঠিটাকে দু'হাতে মাথার ওপর তুলে সে-ও জঙ্গলের দিকে ছুটল। অন্ধকারেও অভিরাম দেখল হোগলা আর তারা বনের পাতাগুলো অনেক দূর পর্যন্ত নড়ছে, দুলছে, উঠছে, নামছে। কয়েকটি মুহূর্ত। পাতার নাড়াচাড়া আর দুলুনি আর নেই। হঠাৎ মেঘ সরে যাওয়ায় চাঁদের আলো পড়ে হোগলা পাতাগুলো তলোয়ারের মতো ঝকঝক করে উঠল।

রাত শেষ হয়ে এসেছে। নষ্ট পচাগলা লোকটা টলতে টলতে ঘরে ফিরতে ফিরতে ভাবছে দুইডারেই বাগে খাইছে, বাঘিনীটা বুজি কাচেই আছিল। পর মুহূর্তেই একটা প্রশ্ন তাকে বাঘের দাঁতের চেয়েও ধারালো দাঁতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলতে লাগল। বাঘ তো জাপাইয়া পরনের সোময় ডাক গজ্জন করে, বাঘের এট্টাও ডাক গজ্জন হুনলাম না ক্যান?